লেনিনবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন ও নয়া-উদারবাদী মতাদর্শের বিশ্ববিজয়— সাম্প্রতিক সময়ের এই দুই বাস্তবতা মানুষের মনোজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ‘শ্রেণী’, ‘শ্রেণী রাষ্ট্র’, ‘শ্রেণী শাসন’— ইদানিং এই সব শব্দগুলির গ্রহণ-যোগ্যতা কমছে। ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির যুগ থেকে যে শ্রেণী নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে, যে শাসন ব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন করা হয়, মানুষের মনোজগতে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, সবাইকে কাজ করতে হবে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা মধ্যেই। এই প্রেক্ষিতে ক্ষমতা দখল করার অর্থ হবে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা অর্জন করা, অথবা জনসাধারণের সরাসরি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের সমর্থন অর্জন করা। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করা এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে নূতন রাষ্ট্র গড়ে তোলা— ‘*গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*’ অথবা ‘*রাষ্ট্র ও বিপ্লব*’ পাঠে উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্টরা যেভাবে বিষয়টিকে দেখবেন— ইদানিং বহু বামপন্থীই সেভাবে বিষয়টিকে আর দেখতে চান না। দেখতে যে চান না তার পিছনে আছে চিন্তার জগতে এক বিপুল পরিবর্তন। পরিবর্তনের তাগিদ যা থেকে আসছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে সে সম্পর্কে যা বলা যায় তা এইরকম। রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ে মানুষের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস, তার তত্ত্বায়নের সমাপ্তি ঘটেছে প্রাক্-মার্কস বিদ্যাচর্চাতেই— যার নির্যাস ধরা আছে হেগেলে। তারপর মার্কস ও মার্কসবাদীরা যা কিছু তত্ত্বায়ন করেছেন তার সবটাই কৃত্রিমভাবে আরোপিত এক তত্ত্ব। কৃত্রিমভাবে আরোপিত বলেই এই তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা টিকতে পারলো না। ব্যবস্থাটি ফিরে গেল প্রাক্-মার্কস যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেটাতে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, সবাইকেই বুঝতে হবে। সমস্যা আছে মার্কস্ বর্ণিত শ্রেণীরাষ্ট্রের ধারণার মধ্যেই। আধুনিক রাষ্ট্র চলবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, যে গণতন্ত্র শ্রেণীনিরপেক্ষ। এই ব্যবস্থায় দোষক্রটি থাকতেই পারে। যেটা শোধরানোর জন্য আন্দোলন করা যেতেই পারে। তবে তার জন্য যাকে ছোট বৃত্তের সংগ্রাম— নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার, গরীবের জন্য কিছু রিলিফ আনার ব্যবস্থা— শিক্ষা, স্বাস্থ্য— এসব নিয়ে, পরিবেশ বাঁচানো নিয়ে, নর্মদা নিয়ে, ভূপাল নিয়ে লড়াই চলবে। কিন্তু পাল্টা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ার কোনো গ্রান্ড ডিস্কোর্স চলবে না, কারণ এরকম কিছু হয় না। করতে গেলে দেখা যাবে সেটা হয়ে পড়ছে স্বাভাবিকের ওপর আরোপিত এক ব্যবস্থা, যা টিকতে পারছে না।

ক্ষমতা দখলের রণকৌশল নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে যে বিতর্ক, সে বিতর্ক নিয়ে কোনো আলোচনা করার আগে এই নির্মম সত্যটি বুঝতে হবে যে, তাঁদের সঙ্গে বহু পথ একসঙ্গে হেঁটেছেন এমন বন্ধুদেরও একটা বড়ো অংশ এখন আর ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত রণকৌশলের বিতর্কে উৎসাহ পান না। শুধু তাই নয়, সমাজের একটা বড়ো অংশে এখন ‘খণ্ড লড়াই’-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। যাঁদের খুব র‍্যাডিকাল মনে হয়, সেই সুশীল সমাজ (সিভিল সোসাইটি)-এর পুরোধারাও দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র চরিত্র সংক্রান্ত মার্কসবাদী বক্তব্য ভুল। সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, যে ব্যবস্থাটি তাঁদের মতে শ্রেণী-নিরপেক্ষ। এই অবস্থায় মার্কসীয় দর্শনে আস্থা রেখে শ্রেণীরাষ্ট্রের কথা ভাবেন, ক্ষমতা দখল করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র-ভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গড়ার কথা যাঁরা চিন্তা করেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রণকৌশল নিয়ে বিতর্ক করেন, মনে রাখা দরকার, নিজেদের মধ্যে বহু বিতর্ক এবং বহু মতপার্থক্য থাকা সত্বেও, তাঁদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের চরিত্র হওয়া উচিত অবৈরীমূলক। এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে এদেশে রণকৌশলের প্রশ্নে বিরোধী অবস্থান থেকে প্রথম যা গড়ে ওঠে তা হলো বৈরীমূলক সম্পর্ক। সশস্ত্র সংগ্রাম ও সংসদীয় সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত বর্তমান আলোচনার সূচনাতেই একথা উল্লেখ করছি, কারণ মনে রাখা দরকার, মার্কসবাদী দর্শনে যাঁরা আস্থা রাখেন তাঁদের মধ্যেকার বৈরীমূলক সম্পর্কের পূর্ণ সুযোগ নেয় আজকের মতাদর্শগত পরিমণ্ডলে যা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেই মার্কসবাদ-বিরোধী দর্শন। বিতর্ক অবশ্যই করতে হবে, রাজনৈতিক মতপার্থক্যর বিষয়গুলিকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু আজকের এই কঠিন পরিস্থিতিতে অতি অবশ্যই জোর দিতে হবে মার্কসবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যাতে অবৈরীমূলক দ্বন্দ্ব হিসেবেই থেকে যায়, তার ওপর।

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

এদেশে যাঁরা বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নিয়ে রাজনীতি করেন, বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র কী— এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। লেনিন প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ লাইন অনুসরণ করে সিপিআই, সিপিএম এবং বিভিন্ন নকশালপন্থীরা মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল দেশি বুর্জোয়ার ওপরের অংশ এবং তাঁদের সঙ্গে সমঝোতায় আবদ্ধ গ্রামীণ ভূস্বামীর হাতে আছে এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা। অর্থাৎ রাষ্ট্র মূলত এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। যে বিপ্লব এদের উৎখাত করবে তার আশু লক্ষ্য থাকবে বুর্জোয়া বিপ্লবের বকেয়া কাজ, অর্থাৎ সামন্ত-অবশেষ ধ্বংস করার কাজ সাঙ্গ করা। বিপ্লবটিকে তাই তাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত করা হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়টি অতিক্রম করার পর এই বিপ্লবই পরিণত হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, যার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে সাম্যবাদী সমাজে। অন্য দিকে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এই সূত্রায়নে যাঁরা একমত নন, তাঁদের মতে এদেশের বিপ্লবের স্তর হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছতে হবে, এটা তাঁরা মানেন না।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঃ কর্মসূচীগত পার্থক্য এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাধারণ লাইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সিপিআই-র মধ্যে গত শতকের ষাটের দশকে বিভাজন দেখা দেয়। এই বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্ব মেনে নিতে হতে পারে, ফলত বিপ্লবের চরিত্র হয়ে উঠতে পারে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব— ডাঙ্গের নেতৃত্বে এই লাইন গৃহীত হয় সিপিআই-এর সপ্তম (বোম্বাই) কংগ্রেসে। যাঁরা এই লাইনের বিরুদ্ধে, যাঁরা মনে করেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে, তাঁরা সিপিআই থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন সিপিআই(এম)।

শত্রুমিত্র নির্ণয়ে তফাৎ ছাড়াও তাই মিত্রশ্রেণীগুলির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক কী রকম হবে— মিত্র শ্রেণীগুলির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীকেই থাকতে হবে কিনা, দেখা যাচ্ছে, তফাৎ ঘটছে এই বিষয়েটিকে নিয়েও। সিপিএম ভেঙে যখন নকশাল-পন্থীরা আলাদা দল গড়ছেন, তখন দেখা গেল বিভাজনের বিষয় শুধু শত্রুমিত্র নির্ণয় এবং মিত্রশ্রেণীগুলির নেতৃত্বে কে থাকবে সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। শত্রু মিত্র নির্ণয়, নেতৃত্ব নির্ণয়— এসবের পর আছে ক্ষমতা দখলের পথ কী হবে, সে নিয়ে বিতর্ক। মোটামুটি এই ভাবে নকশালপন্থীদের সঙ্গে অন্যদের এই বিভাজন রেখা নির্ধারিত হলো যে, তাঁরা চান সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে, আর অন্যরা চান সংসদীয় রাজনীতির পথে চলতে। সংসদীয় রাজনীতি করতে করতে কোনো এক সময় তাঁরা ক্ষমতায় আসবেন— ঠিক কীভাবে, সেটা যদিও স্পষ্ট নয়। নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে, অন্তত এই আন্দোলনের সূচনাকালে ক্ষমতা দখলের ছকটি ছিলো স্পষ্ট। নকশালপন্থীরা গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা তৈরি করে শেষ পর্যন্ত গ্রাম দিয়ে সহর ঘিরে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে যারা রাজনীতি করেন, তাঁরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে, সেটা এবার দেখা যাক। শত্রু মিত্র বিভাজন বা মোর্চা তৈরির বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। মত পার্থক্য আছে দেশের বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে। এঁদের এক অংশ মনে করেন, পুঁজির আন্তর্জাতিক সংকট থেকেই ভারতে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং সেই পরিস্থিতিতে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটবে, শ্রমিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। অন্য অংশটিও মনে করেন ক্ষমতা দখলের পথ হলো অভ্যুত্থানের পথ। তবে এই অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হবার জন্য পুঁজির আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হওয়া অত্যাবশ্যক, এটা ঠিক নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হলেই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে এবং তার মধ্য দিয়েই ক্ষমতা দখলের পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সম্ভব।

কিন্তু যত দিন না এই সংকট সৃষ্ট হয়, ততদিন কী হবে? এঁদের উভয়েরই মতে, ততদিন সংসদীয় সংগ্রামের ওপরই গুরুত্ব দিতে হবে। এই অর্থে তাঁদের সঙ্গে সিপিআই এবং সিপিএম-এর ঐক্য বা মিলের একটা জায়গা আছে। এদের সঙ্গে সিপিআই, সিপিআই-এর যে মোর্চা গড়ে ওঠে, তার কারণ এটাই। নকশালপন্থীরা যখন গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন, তখন তাঁদের সম্পর্কে এঁরা রাজনৈতিকভাবে উদাসীন থাকেন। কিন্তু যখন নকশালপন্থীরা গণ আন্দোলনে ফিরে আসেন তখন এঁদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য গড়ে ওঠে। ঐক্য গড়ে ওঠে এই কারণে যে তাঁরা মনে করেন অভ্যুত্থানের রাজনীতিতে গণআন্দোলনের ভূমিকা হলো ইতিবাচক। আর এই গণআন্দোলন যদি নকশালপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে করা যায়, তাতে তাঁদের ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি, কেন না রাজনৈতিক দল হিসেবে নকশালপন্থীদের তুলনায় তাঁরা বেশি সংগঠিত, আন্দোলনের সুফল বেশি আসবে এঁদের দিকেই।

বিপ্লবের পথ

পার্লামেন্টারি পথ, না সশস্ত্র সংগ্রাম? কোনটা বিপ্লবের পথ? এটা এমন একটা বিতর্কের বিষয় যা নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিক্ত বিতর্ক চলছে দীর্ঘ দিন ধরে। পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, আসলে এক বিতর্কের মধ্যে অনেকগুলি বিতর্ক আছে এবং বিতর্কগুলো একটার সঙ্গে আর একটা নানাভাবে জড়িয়ে গিয়ে বিষয়টিকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জটিল করে ফেলেছে।

প্রথমে দেখা যাক রাষ্ট্র সংক্রান্ত কমিউনিস্ট চিন্তা। আইন-সভা, বিচার ব্যবস্থা সেনাবাহিনী ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী আর আমলাবাহিনী— এই নিয়ে যে আধুনিক রাষ্ট্র, কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসে সেই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙে দেবে। এর অর্থ কী? নৈরাজ্যবাদীদের বিরোধিতা করে কমিউনিস্টরা বলেছিলেন, ক্ষমতা হাতে নিয়ে কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে দেবে, এমন নয়। তারা বিদ্যমান রাষ্ট্রের বিপরীতে পাল্টা একটা রাষ্ট্র গড়বে। অর্থাৎ একটা পাল্টা সংবিধান হবে, পাল্টা বিচার ব্যবস্থা হবে। পাল্টা সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী হবে এবং কাজ চালাবার জন্য আর একটা আমলাবাহিনী হবে। সোভিয়েতে, চীনে, পূর্ব ইউরোপে, ভিয়েতনামে এটাই হয়েছিলো,। সেই রাষ্ট্রর সঙ্গে গণতন্ত্র, নাগরিক স্বাধীনতা, দলভিত্তিক শাসন ইত্যাদি বহু সমস্যা জড়িয়ে থাকে। এগুলি যদিও বিপ্লবোত্তর সমাজের সমস্যা, মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা কীভাবে দখল করা হচ্ছে তার সঙ্গে এগুলির আবার সম্পর্কও আছে। ইদানিং তো একথা বারবার উঠে আসছে যে দুমাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের নামে বলশেভিক পার্টির একনায়কতন্ত্র চাপানোর জন্যই ব্যবস্থাটি গণউদ্যোগ বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 'দুমা'কে যদি একটা ফোরাম ধরি যেখানে অকমিউনিস্টরাও নির্বাচিত হতে পারে, তাহলে কি কেরেনস্কি সরকার উৎখাত করার পর আবার দুমার অধিবেশন বসানো উচিত ছিল নির্ধারিত সময়ে? নাকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সোভিয়েতগুলিই বিকল্প ক্ষমতার আধার করে তুলে সেগুলিকে বলশেভিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে আনার লাইনটাই সঠিক ছিলো? দেশজোড়া অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের কথা যাঁরা বলেন, এ সমস্যার কথা তাঁদের অবশ্যই ভাবতেই হবে এবং চালু ফোরামগুলি ভাঙার কাজটা আসলে সেগুলিকে বজায় রেখেই তার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার কাজ কিনা, সেটা বুঝতে হবে।

অসম বিকাশের তত্ত্বে যাঁরা আস্থা রাখেন, সমস্যাটা তাঁদের দিক থেকেও আছে। যে এলাকায় তাঁরা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান, সে এলাকার যেসব রাষ্ট্র অনুমোদিত এবং/অথবা সমাজ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, সাধারণ নাগরিকরা যার মধ্য দিয়ে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করে, গণউদ্যোগ বিকাশে যেগুলির ভূমিকা থাকে— সে সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? পঞ্চায়েতগুলিকে তাঁরা কি নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করবেন? জনজাতির ফোরামগুলিকে তাঁরা কি কাজ করতে দেবেন না? সমস্যাটা বিশেষ করে আমাদের দেশে জীবন্ত সমস্যা। কারণ এখানে নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের কাছে এক ধরনের মান্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

যদি বলা হয়, এগুলিকে কমিউনিস্টরাও ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে একথাটাও তাঁদের মেনে নিতে হবে যে জনগণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র যে ধরনেরই হোক না কেন, সশস্ত্র সংগ্রাম কখনই সংগ্রামের একমাত্র রূপ হতে পারে না। এই সব ফোরামগুলিতে সংখ্যাধিক্যের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে এগুলিকে অংশগ্রহণ করা, এসব মারফৎ যেসব জনমুখী কাজ করা সম্ভব— যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, সেগুলি করার চেষ্টা করা, এসবও কমিউনিস্টদের আন্দোলনের একটা রূপ। বস্তুত যে চীন বিপ্লবের কথা 'সশস্ত্র সংগ্রামের পথ'- প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে, সেই চীন বিপ্লবেও সশস্ত্র সংগ্রাম কখনই কমিউনিস্টদের কাছে সংগ্রামের একমাত্র রূপ ছিল না। আইনসিদ্ধ উপায়ে সংগ্রাম গড়ে তোলার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করেছিলো চীনা কমিউনিস্টরা। সোভিয়েত বিপ্লবেও, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিপরীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক কর্তৃত্ব কায়েম করার কাজ দিয়েই বলশেভিকদের যাত্রা শুরু হয়নি। আইনসিদ্ধ সংগ্রামের যাবতীয় উপায়গুলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার মধ্যদিয়েই বলশেভিক দলটি জনগণের আস্থা অর্জনের কাজে শক্তি অর্জন করে।

'পার্লামেন্টারি পথ'-এর বিপরীতে যারা 'সশস্ত্র সংগ্রাম-এর পথ' কথা বলেন, তাঁরা বলবেন, 'পথ' প্রসঙ্গে এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। কেউ বলছে না যে সশস্ত্র সংগ্রামই সংগ্রামের 'একমাত্র রূপ'। 'পথ' সংক্রান্ত বিতর্কে কথাটা হলো ক্ষমতা দখল করা যায় একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। বাকী সব সংগ্রাম এর পরিপূরক সংগ্রাম। এগুলো বাদ দেবার কথা কেউ বলছেন না, তবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে সব ফোরামের আছে সেগুলিতে সংখ্যাধিক্যের সমর্থন আদায় করতে পারলে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা চলে আসবে কমিউনিস্টদের হাতে'— ক্রুশ্চভ উত্থাপিত এই লাইনটি ভুল। শুধু ভুল নয়, এ বক্তব্য সংশোধনবাদী বক্তব্যও বটে, কেননা বলপূর্বক বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎখাত না করলে যে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না, সেই চিরায়ত মার্কসবাদী শিক্ষার সংশোধন ঘটায় এই বক্তব্য।

স্মরণ করা যেতে পারে যে বিষয়টি এভাবেই পেশ করা হয়েছিল সিপিআই-এর বিভাজন কালে এবং এর পরিপ্রেক্ষিত ছিলো ১৪ জুনের চিঠি (সিপিসি)। 'সশস্ত্র সংগ্রাম-এর পথ'-এর কথা যাঁরা তুললেন সেই নকশালপন্থী বিপ্লবীরা এই বক্তব্যেই যদি থেমে থাকতেন, তাহলে সিপিএম-নকশালপন্থী বিভাজন ঘটার কোনো কারণ থাকতো না। দুপক্ষই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিপরীতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্ট্রাটেজি মেনে নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাধারণ যে ভেদরেখা— সিপিসি'র ১৪ই জুনের চিঠিতে যা স্পষ্ট করে রাখা ছিল, দু পক্ষই যেখানে এক বক্তব্যের শরিক, সিপিআই যা মানতে পারেন নি। 'সশস্ত্র সংগ্রাম-এর পথ'-এর মধ্যে একটা অন্য কথা আছে, প্রথম প্রজন্মের নকশালপন্থী নেতারা যেটা কিছুটা এলোমেলো ভাবে রেখেছিলেন আর সিপিসি'র পূর্ণ মদতে যে এলোমেলো বক্তব্যটা মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের মধ্যেকার ভেদরেখাটাই মুছে দিয়েছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়, ক্ষমতা দখল করতে হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে— এই বক্তব্য মেনে নেবার পর বিতর্কটা উঠতে পারে, ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে কখন করতে হবে এই সশস্ত্র সংগ্রাম, তা নিয়ে। এ বিত

র্কটা আর 'পথ' সংক্রান্ত বিতর্ক নয়। বিতর্কটা হল সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ কখন কমিউনিস্টরা কাজে লাগাবেন, তা নিয়ে। কমিউনিস্ট বাক্‌ধারায় এটা হল 'রণকৌশল'-এর প্রশ্ন। বিতর্কটায় ঢুকতে হলে প্রথমে মেনে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম হলো সংগ্রামের একটি রূপ, ক্ষমতা দখল আশু লক্ষ্য না হলেও যা করতে হতে পারে (যথা তেভাগার লড়াই)। এই সংগ্রামের সর্বোচ্চ প্রকাশ ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে। দ্বিতীয় যে কথাটা মানতে হবে তা হল, সংগ্রামের এই রূপটি গ্রহণ করার অর্থ সংগ্রামের অন্যান্য রূপকে নাকচ করা নয়। যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় নেই তখন তো নয়ই, এমনকি যখন ক্ষমতা কেন্দ্রগুলিতে কমিউনিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখনও হয়তো দেখা যাবে কিছু ফোরাম চালু আছে যেগুলিতে অন্য উপায়ে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে কমিউনিস্টদের। এই সব কথা মনে রেখেই, ক্ষমতা দখল যখন সত্যিই কমিউনিস্টদের এজেন্ডায় চলে এলো সেই যুগে, অর্থাৎ লেনিনের যুগে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কমিউনিস্টরা (তার আগের যুগে একটি অসফল প্রচেষ্টা অর্থাৎ প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছে, তবে তা এসেছে অনেকটাই প্রান্তিকভাবে এবং সেটাও নেতিবাচক শিক্ষা হিসেবে)। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা সব কয়টি দলই পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ সহ সংগ্রামের সব রূপগুলোই গ্রহণ করার কথা ভেবেছেন। শুধু তাই নয়। বুর্জোয়া শাসন যে আইনসভা ভিত্তিক শাসনের কথা বলে, তার প্রেক্ষিতে এটাও বলা হল যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যেহেতু সমাজের সংখ্যাধিক নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করেন (কেন না সংখ্যাধিক নাগরিকই শ্রমজীবী), সার্বজনীন ভোটাধিকার-ভিত্তিক নির্বাচনে তারাই আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন এবং ফলত তাঁরা আইনি উপায়েই ক্ষমতা পেতে পারেন। এঙ্গেলস যে সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, লেনিনবাদীরা তাতে যা যোগ করলেন তা হল, কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিরা কখনই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছাড়বেন না আর সে কারণেই শ্রমজীবিদেরও তৈরি থাকতে হবে অশান্তির মোকাবেলায় পাল্টা অশান্তি করতে। সেই অশান্তি কখন সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ রূপান্তরিত হবে, লেনিনবাদীরা সেটাও সূত্রায়িত করেছিলেন। যে সব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু আছে, সশস্ত্র সংগ্রামের রণ-কৌশল সংক্রান্ত চিরায়ত লেনিনবাদী শিক্ষা বুঝতে হয় এই বিচার ধারায়। যেখানে এই ছক কাজে লাগবে না, সেটার সূত্রায়ণ করতে হলে লেনিনবাদীরা শুরু করবেন এই বক্তব্য থেকে যে, 'ব্যবহার করার মতো কোনো পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি সে দেশে' সুতরাং এ ছকটি কাজে লাগানো যাবে না সেখানে। চীনের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে রণকৌশল সংক্রান্ত আলোচনা ঠিক এভাবেই শুরু করেছিলেন মাও সে তুং (দ্রষ্টব্য: যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা)। ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদ বিরোধিতা করতে গিয়ে এই সাধারণ লেনিনীয় রূপরেখাটি নাকচ করা কখনই ঠিক নয়। আর এই ভুলটাই করেছিলেন নকশালপন্থীরা।

প্রথম প্রজন্মের নকশালপন্থীরা এরকম কোনো কথা থেকে শুরু করলেন না যে এদেশে ব্যবহার করার মতো কোনো পার্লামেন্ট নেই। কাজেই তাঁদের জন্য খোলা আছে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। সে সব বিতর্কে তাঁরা ঢুকলেনই না, কারণ সশস্ত্র সংগ্রাম তাঁদের কাছে 'রণকৌশল' নয়, 'রণনীতি'। এই জায়গায়টায় তাঁরা পৌছোলেন সম্ভবত একটা সোজা সমীকরণ থেকে। সমীকরণটা হল পার্লামেন্ট ব্যবহার করা আর পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়া একই জিনিষ, আর ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদ যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখলের কথা বলছে, এটা হলো সেই বিষয়টাই। এই সূত্রায়ণের যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হলো, এ দেশে যত সংসদীয় বামপন্থী দল আছে সবই হলো সংশোধনবাদী দল। পূর্ববর্তী উপবিভাগে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে যে রণনীতিগত পার্থক্যের কথা আমরা আলোচনা করেছি, প্রথম প্রজন্মের নকশালপন্থীদের কাছে সে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আর থাকলো না। থাকলো না, কারণ 'রণনীতি'র সংজ্ঞাটাই তাঁরা বদলে দিলেন। ঠিক যেভাবে নৈরাজ্যবাদীরা শ্রমিক আন্দোলনে বিভাজন ঘটিয়ে শত্রুসংখ্যা বাড়িয়ে চলে, ঠিক সেভাবেই তাঁরা 'সশস্ত্র সংগ্রাম' না 'পার্লামেন্টারি পথ'— এই বিতর্ক তুলে, বিতর্কটিকে তার নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে নিয়ে গিয়ে (পার্লামেন্টে যাওয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়া) শ্রমিক আন্দোলনে সম্ভাব্য বন্ধুদের শত্রু করে তুললেন। রণনীতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এদের সঙ্গে যে রণকৌশলগত ঐক্য গড়া সম্ভব, সেটা এঁদের কাছে আর প্রাসঙ্গিক থাকলো না, কারণ রণকৌশলগত পার্থক্য এঁদের সংজ্ঞায় দাঁড়িয়ে গেল রণনীতিগত পার্থক্যে।

বিষয়টা শুধু সংসদীয় রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকলো না। সশস্ত্র সংগ্রাম রণনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে সংগ্রামের অন্যান্য রূপ— গণসংগঠন ও গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ঘটে, সেটাও বাতিল হয়ে গেল। ট্রেড ইউনিয়ন বয়কট, কৃষকসভা বয়কট, ছাত্র সংগঠন বয়কট, শিক্ষক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন— সবই চলে এলো বয়কটের আওতায়। থাকলো শুধু সশস্ত্র স্কোয়াড, যার সদস্য হতে হলে গলা কাটার কৌশল আয়ত্ব করতে হবে। প্রমোদ সেনগুপ্ত সঠিকভাবেই এটিকে পুৎসিবাদের নয়া সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

লেনিনবাদের চিরায়ত শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিস্টদের একটা ভালো অংশ যে এই রাজনীতি গ্রহণ করেছিলেন, এই রাজনীতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, মৃত্যুবরণ করে-ছিলেন— তার কারণ কী? এঁরা কি নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদের বিভাজন রেখাটি কোথায়, জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শ আশ্রিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগুলি ছিল, এই সব বক্তব্যের উৎস হলেন তাঁরা। কোনো দিনই এরা প্রায় কোনো স্তরেই দলের সংখ্যাগুরুর সমর্থন অর্জন করতে পারেন নি। আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কের ধারাবাহিকতায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন এই সব উদ্ভট বক্তব্যের প্রবক্তাদেরই 'প্রকৃত মার্কসবাদী' হিসেবে সমর্থন জানালেন এবং এই সব বক্তব্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি জোটালেন লেনিনোত্তর যুগ বা সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ পতনের যুগের ধারণা নিয়ে এসে— নকশালপন্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া মার্কসবাদীদের অধিকাংশই, নিজেদের রাজনৈতিক অপরিপক্বতায় সব কিছু বয়কট আর স্কোয়াড গড়ে ব্যক্তিখুনের রাজনীতিতেই 'বসন্তের বজ্রনির্দোষ শুনতে পেলেন।

বলা বাহুল্য, এ রাজনীতি জনসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় তা হলো এই রাজনীতির প্রবক্তারা (নেতারা) যতই তাঁদের ভুল শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন, ততই দলটি ভাঙতে লাগলো। প্রায় এক প্রজন্মকাল ধরে চলল এই প্রক্রিয়া এবং এখনও দেখা যাচ্ছে, বাম রাজনীতির মূল স্রোতে এই রাজনীতিকে নিয়ে আসা কঠিনই থেকে যাচ্ছে। এর কারণ কী? সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা এবং ক্রুশ্চভের ভুয়া সাম্যবাদের শরিক হওয়া যে এক নয়, এটা বুঝতে হলে সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ সংক্রান্ত পুরোনো লেনিনীয় ধারণায় ফিরতে হয়। সেটা করতে হলে আগের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং 'বিপ্লবের পথ'-এর অন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত সূত্রায়নটি ছাড়তে হয়। সেটার যুক্তিসংগত ধারাবাহিকতায় আবার আসে রণনীতি সংক্রান্ত বক্তব্যটির পূর্ণমূল্যায়ন যার পরিণামে নকশালপন্থা যে বিশেষ দিশার রাজনীতির কথা বলে, সেটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এসবের শেষটায় থাকে বিলোপবাদের ভয়, যেটা এড়াবার তাগিদে কখনই এই পথ সংক্রান্ত বিতর্কটিকে নকশালপন্থীরা ঠিকভাবে মোকাবেলাই করতে পারেন না। পরিণামে দল ভাঙে, নূতন কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং টিকে থাকার তাড়নায় এঁরা বাম দলগুলির সংকট থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার যুক্তি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সংসদীয় সংগ্রাম ও বামপন্থার সংকট

সংসদীয় সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টিকে আমরা যদি লেনিনীয় অবস্থান থেকে বিচার করি তাহলে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল হবে, না শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখল হবে— এটা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকে না। ক্ষমতা দখল করতে হবে সশস্ত্র উপায়েই, কেননা প্রতিক্রিয়া কখনই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইবে না। কিন্তু কখন এই সশস্ত্র সংগ্রাম ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে? সেটার কিছু পূর্বশর্ত আছে। প্রথমত, সমাজে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট মানতে হয়, যাতে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণীর পক্ষেও বিদ্যমান ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়তে হবে, যার বাহ্যিক লক্ষণ শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিপ্লব যাঁরা করবেন, চূড়ান্ত পরিবর্তনের পর্যায়ে সমাজকে নিয়ে যাবার মাত্রায় তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, যেটি আসলে, বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদান। এ

কই সঙ্গে বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদানের দ্বান্দ্বিক ঐক্য না ঘটলে আবার শাসকশ্রেণীর মধ্যে যত দ্বন্দ্বই যাক, পরিবর্তনের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা যত তীব্রই হোক, সামাজিক দ্বন্দ্বের নিরসনের লক্ষ্যে সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হবে।

বলা বাহুল্য, এ হল ধ্রুপদী বিপ্লবের তাত্ত্বিক ছক এবং এ রকম ছকে ফেলে কোনো সফল বিপ্লবেরই আলোচনা হয়না। প্রতিটা দেশের, প্রতিটি সময়ের থাকে নির্দিষ্ট বাস্তবতা এবং সেটা ভালো করে না বুঝে ছকে ফেলা কোনো তত্ত্ব দিয়ে বিপ্লবের কাজটা করা যায় না। তবুও একটা কথা অবশ্যই বলা যায়। যে সমাজে বিপ্লব হতে চলেছে, সে সমাজে বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের অবশ্যই মোহমুক্তি ঘটতে হবে, যেটা না হলে ভাঙচুর করে অন্য কিছু ব্যবস্থা আনতে জনগণ অবশ্যই অগ্রসর হবেন না। আবার জনগণ অগ্রসর না হলে শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বও তীব্র হবে না এবং বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানও শক্ত হয়ে উঠবে না। বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি যে ঘটছে, কী দিয়ে তা বোঝা যাবে? বোঝা যাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মাত্রা দিয়ে। যে প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে শাসকশ্রেণী তার শাসন কায়েম রাখে, সেগুলির ওপর জনগণের আস্থা যদি ক্রমশ কমে আসে তাহলে বুঝতে হবে বিপ্লবের সাহায্যে বিদ্যমান ব্যবস্থা ভেঙে দেবার পরিস্থিতি ক্রমশ পরিপক্ক হয়ে উঠছে। আর তা যদি না হয়, শত প্রচেষ্টা সত্বেও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী জনসমর্থনের অভাবে ব্যর্থ হবে। যেখানে ব্যবহার করার মতো পার্লামেন্ট আছে, আছে বিভিন্ন স্তরে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান (যথা রাজ্য বিধানসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত ও পুরসভা) সেখানে এগুলি ব্যবহার করে যাঁরা বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানকে পরিপক্ক করতে চাইবেন, তাঁদের অবশ্যই এ লক্ষ্য থাকবে যে তাঁরা এগুলোত অংশগ্রহণ মারফৎ এগুলির অসারতা সম্পর্কে জনগণকে ক্রমাগত অবহিত করবেন, যাতে এগুলির ওপর থেকে জনগনের আস্থা ক্রমশ চলে যেতে থাকে এবং বিকল্প একটি জনমুখী (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আইনসভাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের পক্ষে এটাই হলো লেনিনবাদী যুক্তি এবং আমাদের দেশে প্রথম যুগের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এই যুক্তিতেই এই সব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হবার জন্য ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। সেটা নিঃসন্দেহে ঠিকই ছিলো। আমাদের দেশে নানা কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে ছিল ব্রিটিশ শাসনের যুগ থেকেই। স্বাধীনতার আগেই এগুলি একভাবে মান্যতা পেতে শুরু করে আর স্বাধীনতার পর এই প্রতিষ্ঠানগুলি যখন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে শুরু করলো, তখন এগুলি আরও বেশি মান্যতা পেলো জনগণের মধ্যে। এই অবস্থায়, এগুলিকে উপেক্ষা করে চীনের কায়দায় এখানে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা যেতো না। বরং এগুলির মধ্যে অংশগ্রহণ করে, শাসকেরা যে এইসব প্রতিষ্ঠান মারফৎ তাদের শ্রেণীশাসনের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে, যাকেই ভোট দেওয়া হোক, নীতির বদল হয় না— এই প্রচার বামপন্থীরা অনেক ভালো করে করতে পারতেন। বিরোধী হিসেবে সে কাজটা তাঁরা ভালভাবেই করেও গেছেন বহুদিন।

সমস্যা দাঁড়ালো তখনই যখন তাঁদের ধারাবাহিক প্রচার এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে জনগণ তাঁদের শাসক হিসেবে দেখতে চাইলেন। দিল্লীতে সে পরিস্থিতি হয়নি কখনও, যদিও বামদের সমর্থন-নির্ভর সরকার সেখানে ক্ষমতায় থেকেছে গত শতকের নব্বই-এর দশকের শেষ দিকে এবং এই দশকের প্রথম দশকের প্রায় পাঁচ বছর। সে পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়েছে দেশের তিনটি অঙ্গরাজ্যে। যার মধ্যে একটিতে একাদিক্রমে তেত্রিশ বছর ক্ষমতায় থেকেছেন বামপন্থীরা। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এই সব অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা কম। তবুও শাসক হিসেবে বামপন্থীরা অবশ্যই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বেশ কিছু জনমুখী কাজ করেছেন সে সব রাজ্যে। কিন্তু যে লেনিনীয় সর্ত পালন করার কথা ছিল এই বামপন্থীদের— বিদ্যমান ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করা এবং জনগণকে ক্রমশ বিদ্যমান-ব্যবস্থা বিরোধী অবস্থানে নিয়ে আসা, সেটা ঘটলো না। বরং উল্টেদিকে, ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বাড়লো এবং এঁদের বদলে অন্যরা ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতির জনমুখী পরিবর্তন ঘটবে, এই ধারণা বৃদ্ধি পেলো। এর সঙ্গে এসে জুটলো আর এক ব্যাধি। যে বামপন্থীদের হবার কথা ছিল অন্য এক ব্যবস্থার (উন্নততর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) প্রতিনিধি, তারাই ক্রমশ হয়ে উঠলেন শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি। কথা ছিল, এঁরা পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানকে মজবুত করবেন। দাঁড়িয়ে গেল এটাই যে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এঁদের ব্যবহার করে প্রতিবিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদানকে মজবুত করে তুলল।

এই অবস্থা থেকে কি এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে নকশালপন্থীদের আদি বক্তব্যই সঠিক ছিল? পার্লামেন্ট ব্যবহার করা আর ক্রুশ্চভের ভূয়া সাম্যবাদী পথ গ্রহণ করার মধ্যে সারের দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই? এদেশে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে গেলে বামপন্থীদের আসলে সংশোধনবাদী হওয়াটাই ভবিতব্য? আমরা মনে করি, এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। বহু ব্যর্থ সশস্ত্র বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের হাত শক্ত করার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা যেমন বলা যায় না যে সশস্ত্র বিপ্লব পন্থা হিসেবেই ভুল, সংসদীয় রাজনীতি থেকে শাসক দলে রূপান্তরিত হওয়ার বহু অভিজ্ঞতা সত্বেও এটা বলা যায় না যে সংসদীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাটাই রণকৌশল হিসেবে অসিদ্ধ।

আমাদের বক্তব্য, সমস্যার উৎসে আছে বিপ্লবের বিষয়ীগত উপাদান জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা, সমস্ত সংসদীয় বাম দল যে অস্বচ্ছতার দিশার। লেনিনীয় প্রজ্ঞা অনুসারে, অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধির ফলে বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা বৃদ্ধি ঘটে। সেটাই আবার বিপ্লবের বিষয়ীগত শক্তি জোরদার হওয়ার কারণ হিসেবে কাজ করে। বিষয়ীগত শক্তি জোরদার হয়ে ওঠার পিছনে বস্তুগত উপাদান উপাদান অবশ্যই অর্থনৈতিক সংকট এবং তজ্জনিত কারণে জনগণের দিক থেকে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি। কিন্তু বস্তুগত উপাদান জোরদার হয়ে উঠলেই বিপ্লবের বিষয়ীগত শক্তি জোরদার হয়ে ওঠে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় বিপ্লবমুখীনতা আনার জন্য সচেতন প্রয়াস। এই সচেতন প্রয়াসটাই বাম আন্দোলন থেকে হারিয়ে গেছে। কোনো একদিন বিপ্লব হবে। ফলত বিপ্লবমুখীনতা গড়ার কাজটা মুলতুবি থাক। আপাতত 'রিলিফ দেওয়া'র চেষ্টা করে মানুষকে দলমুখী করে তুলতে হবে— এটাই হয়ে উঠলো বামপন্থী কর্মসূচী। এর ফলে হয়তো দলের ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু সেই ক্ষমতা বিপ্লবমুখী ক্ষমতা নয়। রিলিফ দেবার ক্ষমতা কমলে দলের ক্ষমতা কমে। রিলিফ দেবার ক্ষমতা বাড়লে দলের ক্ষমতা বাড়ে। উপরি হিসেবে যা জোটে তা হল বিপ্লবমুখীনতার বদলে দলীয় নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্রমশ শক্ত হয়ে বসা রক্ষণশীল মনোভাব, দলটিকে যা শাসক দলে রূপান্তরিত করে। শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করতে করতে বাম দলগুলি, অনাস্থা বৃদ্ধি ঘটানোর বদলে বিদ্যমান ব্যবস্থার আস্থা বৃদ্ধির হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কাজ করে বিপ্লবের বিষয়ীগত শক্তি কীভাবে জোরদার করা যায়, বামপন্থী অনুশীলনের কাছে এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ রাজ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়া এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে একটি বামফ্রন্ট সরকার চালানোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সার সংকলন করা এ প্রসঙ্গে একটি অতি জরুরি কাজ, বামপন্থীদের যা অবশ্যই আশু অ্যাজেন্ডায় আনতে হবে। 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট'-এর রাজনীতিতে ব্যস্ত বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি অথবা বামফ্রন্টের সংকট থেকে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠা বামফ্রন্টের বাইরে থাকা বাম দলগুলি — সবাইকেই এই কঠিন সত্যটি বুঝতে হবে যে চটজলদি কোনো কিছু করে এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে না। যাঁরা ভাবছেন, এই বিপ্লবমুখীনতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা আমাদের সমস্যা নয়— তাঁরা আসলে এটা বুঝছেন না যে, বিদ্যমান ব্যবস্থার যে প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে যাঁরা যে রাজনীতি করেন, বামফ্রন্ট বড় আকারে সেই রাজনীতিই করে থাকেন; ছোট ছোট স্তরে (যথা পঞ্চায়েত) তাঁরাও বিপ্লব-মুখীনতা রক্ষার সেই সমস্যার সামনে পড়েন, বড় আকারে বামফ্রন্ট যে সমস্যায় তাড়িত।

যাঁরা বলবেন, এই জন্যই প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করে ঘাঁটি এলাকা গড়ার রাজনীতি করার কথা উঠছে, তাঁরা জানেন না— সমস্যাটা তাঁদের জন্যও অপেক্ষা করে আছে, বহু ক্ষয়ক্ষতি, বহু ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে যা তাঁদের বুঝতে হবে, যেভাবে বুঝেছেন তাঁদের আগের জন্মের নেতারা, যাঁরা এখন সংসদীয় সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মেলবন্ধনের মন্ত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন।